''সঙ্কল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত। সঙ্কল্প ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না, এই সার নীতি যার, সেই একমাত্র বিশ্বজয়ী হইতে পারে।''
যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ

মায়েরডাক
MAYER DAK

www.mayerdak.com

''সত্যকে আজ হত্যা করে
অত্যাচারীর খাঁড়ায়
নেই কিরে কেউ সত্য সাধক
বুক খুলে আজ দাঁড়ায়''
—নজরুল

মাসিক বুলেটিন DL. No. 129/2000 E-mail : subhas.chkrbrity@rediffmail.com ফোন নং ঃ ৯২৩৯৭৬৯৯৩৮ আগস্ট ২০১০ মূল্য ঃ ১ টাকা

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন অব্যাহত

নিজস্ব বাংলাদেশ প্রতিনিধি প্রেরিত ঃ

● ১৩ জুন ২০১০ রাতে, সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার বাসুদেবকোল গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু-অধ্যুষিত চাকী পাড়ায়, আগ্নেয়াস্ত্রধারী একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে সাত বাড়ি লুট করেছে। আনুমানিক ১৫ লাখটাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে যাবার সময়, পার্শ্ববর্তী গ্রাম হাট- পাঙ্গাসীতে দুই হিন্দু বাড়িতে হামলা চালিয়ে তিন লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে চলে যায়।

● ১২ জুন ২০১০ ভোরবেলায়, রাঙামাটি টেলিভিশন উপকেন্দ্র এলাকায় এক দরিদ্র আদিবাসী কিশোরীকে (১৪) দুই মুসলিম দুর্বৃত্ত অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে, তার সম্ভ্রম লুট করেছে।

● ২০ জুন ২০১০ রাতে, চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার দিয়াকুল গ্রামের নতুন পাড়ায় হিন্দু ব্যবসায়ী মিলন দাশের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রাধারী কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে, লক্ষাধিক টাকার মালপত্র লুট করে নিয়েছে।

● ১৬ জুন ২০১০ সকালে, রাঙামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার মদন কার্বারিপাড়ায় নিজ জমিতে চাষের কাজ করার সময়, কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তদের ছোঁড়া গুলিতে, বৌদ্ধ ধর্মালম্বী আদিবাসী স্বপন তঞ্চঙ্গ্যা (৩৭) নিহত ও রাহুল তঞ্চঙ্গ্যা গুরুতর আহত হয়েছেন।

● সম্প্রতি নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার ছোট চকচম্পক গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা ধনাঢ্য 'পল্লী চিকিৎসক' চিত্তরঞ্জন প্রামাণিকের বাড়ির ওপর হামলা চালিয়ে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত ভাংচুর ও লুট করে বাংলাদেশী মুদ্রায় ৫৬ লাখ ১৭ হাজার টাকার সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেছে।

● ১০ জুন ২০১০, ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার চরফ্যাশন এলাকার হিন্দু বাসিন্দা হিরালাল হাওলাদার, স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত মোঃ জাফর পণ্ডিত বাহিনীর সশস্ত্র হামলায় নিহত হয়েছেন। দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ উভয়ের মধ্যে ৮ একর জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। ওই দিন ফাঁকা মাঠে হিরালালকে একা পেয়ে জাফর বাহিনী হত্যা করে।

● ১০ জুন ২০১০ ঢাকায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রাণ গোপাল দত্তকে টেলিফোন যোগে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। এ বিষয়ে স্থানীয় থানায় তিনি জিডি করেছেন।

● ২৬ জুন ২০১০ সকাল ছয়টায়, খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা এলাকায় জামতলী গ্রামের বৌদ্ধধর্মালম্বী বাসিন্দা সুশীল ত্রিপুরা (২৫) ও ছাত্রকছড়া গ্রামের বারিজা চাকমাকে (২৮) আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত গুলি করে হত্যা করেছে।

● সম্প্রতি বগুড়া জেলা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু অধ্যুষিত সাহাপাড়া, হিন্দুপাড়া এলাকায় হিন্দু বাসিন্দাদের ওপর চলছে অমানবিক উৎপীড়ন। স্থানীয় আওয়ামী লিগ নেতাও মুসলিম দুর্বৃত্ত সুজানুর রহমানের নেতৃত্বে জমি জবর দখল, জিজিয়াকর আদায় ও দৈহিক নির্যাতন প্রতিদিনই চলে আসছে।

● ২৫ জুন ২০১০ রাত্রি ১০ টায়, ঢাকা শহরে বংশাল থানা এলাকায় হিন্দু যুবক সুমন পাণ্ডের ওপর আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলিম দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে সুমন গুরুতর আহত হয়েছে।

● সম্প্রতি ঢাকা শহরে রায়ের বাজার এলাকায়, ৩২১ রায়ের বাজারের ৩ শতাংশ জমির উপর স্থানীয় হিন্দুরা দেড়শ' বছর পূর্বে একটি কালী মন্দির নির্মাণ করেন। এক বছর পূর্বে প্রতিবেশী মুসলিম দুর্বৃত্ত প্রাচীর গুড়িয়ে দিয়ে মন্দিরের কিছু জমি বলপূর্বক দখল করে। কয়েকদিন পূর্বে সম্পূর্ণ মন্দির ভেঙ্গে একদল সশস্ত্র মুসলিম জমি দখলের জন্য হামলা চালায়। মন্দিরের দেয়ালের কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলে। এ খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে চারদিক থেকে হিন্দুরা ছুটে এসে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রতিরোধের মুখে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

● সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার পূর্বকলমা দাসপাড়া সংলগ্ন হিন্দুদের শ্মশানঘাটের কালীমন্দিরের মূর্তি ভাংচুর করেছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর ফকিরের মদত প্রাপ্ত আলম ভুঁইয়া (৪৫), পাভেল শেখ (২৫) ও মাসুদ ভুঁইয়া (২৫) বোমা মেরে মন্দির ও শ্মশান উড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়ে আসছিল গত এক মাস যাবত।

● সম্প্রতি যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার খেদাপাড়া এলাকায় হিন্দু ঋষি সম্প্রদায়ের এক গৃহবধুর সম্ভ্রম লুট করেছে সাহাবুদ্দিন নামে এক মুসলিম পুলিশ। এই ঘটনায় তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করে নাই পুলিশ।

● সম্প্রতি নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার কালীনগর গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা বিশ্বজিৎ রায়ের ৫০ হাজার টাকার মাছ নলদি ফাঁড়ির পুলিশের সামনে লুট করে নিয়েছে একদল মুসলিম দুর্বৃত্ত।

● সম্প্রতি নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার রাইসমিল নিচু কলোনী এলাকার হিন্দু বাসিন্দা, মানিক রায় ৮ শতক জমি বিক্রির কারনে, এক লাখ টাকা জিজিয়াকর বাবদ দাবি করে স্থানীয় ইসলামী দুর্বৃত্ত খায়রুল ইসলাম। টাকা দিতে অপারগতা জানালে দুর্বৃত্তরা মানিক বাবুকে বেদম প্রহার করে গুরুতর আহত করেছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

বামে সিলেট এম. সি. কলেজের হিন্দু ছাত্র উদয়ন সিংহকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে মুসলিম দুর্বৃত্তরা। ডানে দাদাকে হারিয়ে আর্তনাদরত বোন অনামিকা

বাংলাদেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যা কি বোঝা নয়?

শিশির মোড়ল ঃ প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেত্রী শেখ হাসিনা ২ জুন জাতীয় সংসদে বলেছেন, 'বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে আমি শক্তি মনে করি, বোঝা নয়। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কত দূর পর্যন্ত যাব, তা আমাদের ভাবতে হবে। বিশ্বের অনেক দেশে যে অস্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা, বিশেষ করে যুব জনগোষ্ঠী কমে যাচ্ছে, তা কাজে লাগানোর তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে কোনো সমস্যা মনে করি না।'

প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্য কতটা বাস্তবমুখী আর কতটা ইউটোপিয়ান, তা অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। পূর্ববর্তী সরকারগুলো তো বটেই, বর্তমান সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গেও তাঁর এ বক্তব্য সংগতিপূর্ণ নয়। এতে এ কর্মসূচিতে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তারা যেমন ভুল বার্তা পেতে পারেন, তেমনি তাঁরা ব্যর্থতা আড়াল করারও সুযোগ পাবেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই, গণমাধ্যমে হাজারো বিষয়ের ভিড়ে জনসংখ্যার বিষয়টি আলাদা করে আর নজর কাড়ে না। মূল ধারার উন্নয়ন আলোচনায় জনসংখ্যার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দক্ষ জনশক্তি। কিন্তু দক্ষ জনশক্তি কীভাবে গড়ে তোলা হবে, কত দিনে তা সম্ভব হবে, সে সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা নেই।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের একটি জাতীয় নীতি ও কর্মসূচি থাকলেও তা বাস্তবায়নের হার মন্থর। শরিক মৌলবাদী দলগুলোর বিরোধিতার কারণে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে অগ্রাহ্য করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগ যে শুধু জনসংখ্যা বিশেসজ্ঞদের নয়, আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতারাও করতেন। তাঁরা কি আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন? জোটের জনসংখ্যা-নীতিকেই মেনে নিচ্ছেন?

দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা কী? বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাধিক জনসংখ্যাধিক্য দেশ। প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে এক হাজার ১০০ মানুষ, যার তুলনা নগররাষ্ট্র সিঙ্গাপুর ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না। সিঙ্গাপুরের লোকসংখ্যার প্রায় শতভাগ শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধা, দারিদ্র, অপুষ্টি, রোগব্যাধির শিকার। অতিরিক্ত জনসংখ্যা প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেবল বিপন্নই করছে না, বাড়াচ্ছে সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ। সম্প্রতি পুরান ঢাকার নিমতলীতে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল, তারও মূলে ছিল অতিরিক্ত জনসংখ্যা। অপ্রশস্ত সড়ক, ঘিঞ্জি গলি। একই স্থানে বাসাবাড়ি, চায়ের দোকান, কারখানা ও রাসায়নিক পদার্থের গুদাম। কোথাও এতটুকু ফাঁকা জায়গা নেই।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে, বনভূমি উজাড় হচ্ছে, নদী-নালা জলাশয় সব দখল হয়ে যাচ্ছে। কি গ্রাম, কি শহর—সবখানেই জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে। স্বাধীনতার আগে যে ঢাকা শহরে লোকসংখ্যা ছিল ১০ লাখ, সেখানে আজ এক কোটি ৩০ লাখ লোকের বাস। সেই অনুপাতে শহরের আয়তন বাড়েনি। বাড়বে কীভাবে? মানুষের সংখ্যা যত বাড়ছে, শস্যজমি তত কমে যাচ্ছে। প্রতিদিন আড়াই হাজার নতুন মানুষ ঢাকা শহরে স্থায়ীভাবে যুক্ত হচ্ছে।

এরপর তিনের পাতায়

উৎপীড়ন অব্যাহত

● ৩ জুলাই ২০১০, লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার উত্তর চরপাতা গ্রামের হিন্দু বাসিন্দা নিরঞ্জন চন্দ্র দেবনাথের কিশোর পুত্র, পলাশচন্দ্র দেবনাথকে (১৪) মোবাইল ফোন চুরির অজুহাতে-স্থানীয় আওয়ামী লীগের কতিপয় মুসলিম নেতা আট ঘণ্টা গাছের সঙ্গে বেঁধে দৈহিক নির্যাতন চালিয়েছে। গাছের সাথে বাঁধা অবস্থায় প্রতি ঘণ্টায় পলাশের দেহে বেত্রাঘাত করা হয়। স্থানীয় মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের তাড়া করে পলাশকে উদ্ধার করে নিয়ে, রায়পুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

● ৫ জুলাই ২০১০ রাতে, টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার কোনাবাড়ী বাজারে খ্রীষ্টধর্মী এক গাড়ো আদিবাসীকে নির্মমভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্ত। দুই একর কৃষি জমি জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করতে না পেরে দুর্বৃত্তরা উক্ত আদিবাসীকে হত্যা করে।

● ৩ জুলাই ২০১০ কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার মালিয়া গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের শতাধিক বছরের প্রাচীন মন্দির ও শ্মশানের চার শতাংশ জমি স্থানীয় মুসলিম দুর্বৃত্ত আবুল কাশেম ও তার দলবল জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে।

● ঢাকা শহরে অবস্থিত ১৮০ কাঠা জমির ওপর হিন্দুদের প্রাচীন পোস্তগোলা মহাশ্মশানের ১৪০ কাঠা জমি সরকারী মদতপ্রাপ্ত মুসলিম দুর্বৃত্তরা দখল করে নিয়েছে। অনুরূপভাবে শহরের ১০০ কাঠা জমির ওপর লালবাগ শ্মশান। মুসলিম দুর্বৃত্তদের দখলের ফলে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

● ৬ জুলাই ২০১০, ঢাকা শহরে রমনা থানা এলাকায়, মৌচাক আয়েশা শপিং কমপ্লেক্সে অ্যাপার্টমেন্টের হিন্দু বাসিন্দা, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী জজ ঝুমুর গাঙ্গুলী ও তার পরিবার কতিপয় মুসলিম দুর্বৃত্তদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন। হামলাকারীরা অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর পূজা করা যাবে না বলে পূর্বেই সাবধান করে। ঝুমুর দেবী এসব কথায় কর্নপাত না করে ওই দিন পূজা শুরু করেন। এরপর দুর্বৃত্তরা লোহার রড নিয়ে হামলা চালিয়ে তিনটি পূজিত প্রতিমা ভাংচুর করেছে। নগদ ৭৫ হাজার টাকা, সোনার চেইন সহ মুল্যবান জিনিসপত্র হামলাকারীরা লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

● ৯জুলাই ২০১০ সকাল দশটায়, রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মানিক্যাপাড়া এলাকায় বৌদ্ধধর্মালম্বী প্রকাশ চাকমাকে (২৮) কতিপয় আগ্নেয়াস্ত্র ধারী মুসলিম দুর্বৃত্ত গুলি করে হত্যা করেছে।

● ১২ জুলাই ২০১০ বেলা দেড়টার সময়, সিলেট এম সি কলেজের গণিত বিভাগের তৃতীয়বর্ষের হিন্দু ছাত্র উদয়েন্দু সিংহকে (২২) ওই কলেজের কতিপয় মুসলিম সহপাঠী ছাত্র ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। নিহত উদয়েন্দু ও হত্যাকারীরা উভয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের কর্মী।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

● পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পর এবার ত্রিপুরা বিধানসভাও জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি সংবলিত একটি সর্বদলীয় প্রস্তাব গত ১০ জুন গৃহীত হয়েছে। এখন এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো হবে। সেখান থেকে পাঠানো হবে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট।

● আগামী ছয় মাসের মধ্যে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকায় পাওয়া যাবে ল্যাপটপ। বাংলাদেশ টেলিফোন সংস্থা এ ল্যাপটপ উৎপাদন করবে। টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাহিজউদ্দিন আহমেদ একথা জানিয়েছেন।

● চট্টগ্রামের সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে চীন সহায়তা দেবে। চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলোচনার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১৪ জুন বাংলাদেশ সফররত চিনা ভাইস প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা করেন।

● বাংলাদেশের কারাগারে ৩৪৯ জন ভারতীয় আটক রয়েছে। ৬৬৬ মিয়ানমার, পাকিস্তানের ২১, তানজানিয়া ৩, নেপাল ৬, জাপান, মালয়েশিয়া ও হাঙ্গেরির একজন করে নাগরিক আটক অবস্থায় রয়েছে।

● বাংলাদেশে শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের আট শতাংশই এইডসে আক্রান্ত। তাই যুবক যুবতীদের এইডস সম্পর্কে পরিস্কার জ্ঞান থাকা উচিত। এ কারণে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যসূচিতে এইডস অন্তর্ভূক্তি জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

● প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধীর একমাত্র ছেলে বরুন গান্ধী আগামী ১১ ডিসেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন। পাত্রী এক বঙ্গললনা—যামিনী রায় চৌধুরী। যামিনীর পূর্বপুরুষ ছিলেন শান্তিনিকেতনের আদি বাসিন্দা। দিল্লীর সেন্ট স্টিফেনস কলেজ থেকে দর্শনে স্নাতক পাস করে বর্তমানে ফ্রান্সের সোর্বণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাশন ডিজাইনের পড়াশোনা করছেন।

● ১০১ দোররা মারার বিধান (বেত্রাঘাত) শরিয়তে নেই, এটা নিছক গ্রাম্য সালিস। ফতোয়ার নামে যে গ্রাম্য সালিশ চলছে, তা ইসলাম সমর্থিত নয়। ৫ জুন ঢাকা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা চক্রে ইসলামী আইনজ্ঞরা (মুফতি) এ মন্তব্য করেছেন। গহরডাঙ্গা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুফতি রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্রে মুফতি আবদুল মালেক এ মন্তব্য করেন।

● দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার চণ্ডীপুরের তিলেশ্বরী আড়ার ঢিবির মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে এলাকার মুসলিম দুর্বৃত্ত আবু তাহের। ওই ঢিবির নিচেই রয়েছে অষ্টম শতকের পাল আমলের একটি বিষ্ণু মন্দির। একাধিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন চুরি করে নিয়ে গেছে তাহের মিয়া। ইতিমধ্যে উক্ত ভূখণ্ড জাল দলিলের মাধ্যমে মালিকানা সত্ব দাবি করেছে আবু তাহের।

বাংলাদেশ থেকে চীন ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ 'রাজার দোষে রাষ্ট্র ভাগ, প্রজা পালিয়ে বেড়ায়।' এক ভারত ভাগ করে জন্ম হয়েছে আফগানিস্তান (গান্ধার দেশ) পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। প্রকৃত ভারতীয়রা সেখানে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এই ত্রি'খণ্ডে এখন ইসলামী জঙ্গীবাদের রমরমা মার্কেট। পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ইণ্টার সার্ভিস ইণ্টিলিজেন্স ঔরসজাত জঙ্গীরা অর্থবল, অস্ত্রবল ও লোকবলে বলীয়ান হয়ে, বাংলাদেশ থেকে চীন পর্যন্ত এক বৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নে বিভোর। নানা রং, নানা নামধারী শত শত এসমস্ত সংগঠন একই সূত্রে বাধা। জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জে এম বি) এদের মধ্যে অন্যতম এক দুধর্ষ ইসলামী জঙ্গী সংগঠন। সংগঠনের জেহাদী কর্মীরা মনে করেন, জেহাদ (যুদ্ধে) মৃত্যু হলে বেহেস্ত (স্বর্গ) লাভ। বেচে থাকলে এক বৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্রলাভ। এই বিশ্বাস কতটুকু ফলপ্রসু হবে তা' আগামী দিনগুলিতে বুঝতে অসুবিধা হবে না।

এই সংগঠনের হাতে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন তিন হাজার বোমা ও ১০ টি সুইসাই ভেস্ট বা আত্মঘাতী হামলায় ব্যবহারযোগ্য কোমরবন্ধনী রয়েছে। এরকম ৪০টি সুইসাইডভেস্ট তৈরি পরিকল্পনা রয়েছে। জে এম বির জঙ্গীরা রকেট লঞ্চার তৈরির কলাকৌশলও আয়ত্ব করেছে। ইতিমধ্যে তিনটি রকেট লঞ্চার তৈরি করে বরগুনায় সুন্দরবন এলাকায় সফল পরীক্ষা করেছে। তাদের সংগঠনে আত্মঘাতী হামলায় প্রশিক্ষিত সদস্য আছেন ২৫ জন। বোমা, কোমরবন্ধনী ও রকেট লাঞ্চার তৈরির কারিগর আছেন ৫০ জন। সুইসাইড ভেস্টের মধ্যে যে বোমা সংযুক্ত ছিল, এ ধরনের প্রযুক্তির বোমা এল টি টি গেরিলারা শ্রীলংকায় আত্মঘাতী হামলায় ব্যবহার করতো। দেশীয় উপাদান, সহজ বহন যোগ্য, গাছের ছাল পুরিয়ে বোমা তৈরীর উপকরণ তারা আয়ত্ব করেছে। পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে ইসলামী জঙ্গীরা এ ধরনের বোমা তৈরির প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে।

বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ির পাহাড়ী গহিন অরন্যে মায়ানমার (বার্মার) রোহিঙ্গা মুসলিমরা গড়ে তুলেছেন "রোহিঙ্গা লিবারেশন অর্গানাইজেশন, আরকান ইসলামিক মুভমেণ্ট, আরকান লিবারেশন ফ্রণ্ট ও রোহিঙ্গা সলিডিটারী অর্গানাইজেশন সহ ইত্যাদি ইসলামী জঙ্গী সংগঠন। এরা পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই ও বাংলাদেশ সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজি এফ আই মদতপ্রাপ্ত। এই সংগঠনের প্রধান কর্নধাররা এক সময় আফগানিস্থানে রুশ সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফেরত জঙ্গী। বাংলাদেশে এসে রোহিঙ্গা মুসলিমদের নিয়ে মায়ানমারের আরকান প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে গেরিলা লড়াই শুরু করে। এর ফলে বার্মা সরকার যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। লক্ষাধিক রোহিঙ্গা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে শরণার্থী শিবিরে বর্তমান রয়েছে। (চলবে)

অনুপ্রবেশকারী তকমা দিয়ে উদ্বাস্তু গ্রেপ্তার, বিতাড়ণ শুরু হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ অনু প্রবেশকারী তকমা দিয়ে বাংলাদেশী উদ্বাস্তু গ্রেপ্তার ও বিতাড়ন শুরু হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। আসাম, উত্তরাখণ্ড ও ওড়িশায় এই কাজ জোর কদমে শুরু হতে চলেছে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক বিধান সভায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন চার হাজার ৮৩ জন বাংলাদেশীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮জনকে 'পুশব্যাক' করা হয়েছে। বাকি চারহাজার পঁয়ত্রিশ জনকে অবিলম্বে পুশব্যাক করার চেষ্টা চলেছে। আসামে ১৯৭১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে হাজার-হাজার উদ্বাস্তুকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছে। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট, বর্ডার শ্লিপ, ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ড দেখিয়ে ও আসামে উদ্বাস্তুরা ছাড় পাচ্ছে না। আতংকিত উদ্বাস্তুরা আসাম ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার কথা ভাবছে। উত্তরাখণ্ডের শক্তিফার্ম, দীনেশপুর, রুদ্রপুর, গদরপুর এবং গোলারভূজ এলাকায় পুর্নবাসন পাওয়া জমি থেকে উদ্বাস্তু উচ্ছেদ করতে তাদের গায়ে অনুপ্রবেশকারী তকমা লাগিয়ে পরিকল্পিত বিতাড়নের চেষ্টা চলছে। ২০০৩ সালে ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের ছোবলে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, চাকমা, বড়ো, হাজং, খাসিয়া মনীপুরীরা অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত হতে চলেছেন। নাগরিকত্বের নথিতে তাদের নামের পাশে (ডি চিহ্ন দিয়ে) ডাউটফুল (সন্দেহজনক) ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হতে চলছে।

পূর্ব পাকিস্তান অথবা বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকররা গত ছয় দশক যাবত সেখানকার সরকার এবং ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশের দ্বারা উৎপীড়িত একথা সরকারীভাবে ভারত সরকার স্বীকার করেন না। সেই কারণে চৈতন্যহীন, পরাধীন উদ্বাস্তুদের স্থান এখন জেলখানায় হতে চলেছে।

শোক সংবাদ

নিখিলবঙ্গ নাগরিক সংঘ ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য চিন্ময় চক্রবর্তী গত ২২ জুলাই বিকালে পরলোক গমন করেছেন। বেশ কিছুদিন যাবত তিনি বার্দ্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মায়ের ডাক পত্রিকা জন্মলগ্ন থেকেই তিনি পত্রিকা নিয়ে বনগাঁ, কৃষ্ণনগর, ডানকুনী, বর্দ্ধমান পর্যন্ত শখের হকারী করতেন। চিন্ময়বাবু নিঃস্বার্থ শ্রমের কারণে মায়ের ডাক পত্রিকার পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার মৃত্যু সংবাদে নিখিলবঙ্গ নাগরিক সংঘের সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। গড়িয়া, সোনারপুর, সুভাষগ্রাম এলাকায় বি জে পি কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া দেখা যায়। শতশত তার গুনমুগ্ধ মানুষ চিন্ময় বাবুকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবেন।

জনসংখ্যা বোঝা নয়?

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই জনসংখ্যার সমস্যাকে দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, তাতেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। ওই বছরের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিতে গিয়েও বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে প্রত্যেক বৎসর আমাদের ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হল ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তাহলে ২৫-৩০ বৎসরে বাংলার কোন জমি থাকবে না হালচাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সে জন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্লানিং করতে হবে।'

বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্য জনসংখ্যা সমস্যার ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যায়। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩—১৯৭৮) জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ৩৫ বছর পর সেই সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে।

যদিও জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ঠিক এর বিপরীত ধারণাই দেয়। তিনি যে জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করতে চাইছেন, তার একটি চালচিত্রটা দেখা যাক। জাতিসংঘ অধিভুক্ত একটি সংস্থার পরিসংখ্যানমতে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ছাড়িয়েছে। প্রতি ১১ সেকেণ্ডে একটি নবজাতকের জন্ম হচ্ছে। প্রতিবছর ৩০ লাখ লোক যুক্ত হচ্ছে। এই জনঘনত্ব ভারতের তুলনায় চার গুণ, চীনের চেয়ে আট গুণ বেশি। ৩৩ শতাংশ মা কিশোরী এবং তাঁরা পুষ্টিহীন শিশুর জন্ম দেন। জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য জরিপ মতে, পাঁচ বছরের কম বয়সী ৪১ শতাংশ শিশুর ওজন কম। ৪৩ শতাংশ শিশু খর্বকায়। এরা কি জনসম্পদ? এদের দিয়ে কি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব? কখনোই নয়। দক্ষ জনশক্তির জন্য চাই সুস্থ ও সবল শিশু।

যে দেশে এখনো ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অর্ধেক বেকার বা ছদ্ম বেকার, সে দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যা কখনোই জনশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না। শক্তিধর অর্থনীতির দেশ ভারত ও চীন যেখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি জোরদার করছে, সেখানে বাংলাদেশে এ কর্মসূচিকে অগ্রাহ্য করা বা ভিন্ন চিন্তা হবে আত্মহত্যার শামিল।

প্রধানমন্ত্রী বিদেশে দক্ষ যুব জনশক্তি পাঠানোর কথা বলেছেন। কতজনকে পাঠানো সম্ভব? বর্তমানে বছরে চার-সাড়ে চার লাখ লোক চাকরি নিয়ে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পায়। সেই সংখ্যা যদি দ্বিগুণও হয়, তাহলেও সমস্যার সমাধান হবে না। প্রতিবছর তো ৩০ লাখ মানুষ যুক্ত হচ্ছে। বাকিরা কোথায় যাবে? চাকরি না পেয়ে অনেকেই নানা রকম অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। দারিদ্র নামের আজন্ম পাপ নিয়ে যারা পৃথিবীতে আসে, তারা কেবল পরিবার নয়, সমাজ আর রাষ্ট্রেরও বোঝা হয়ে পড়ে। বর্তমানে দেশে যে জনসংখ্যা আছে, তা স্থিতিশীল রাখতে জন-উর্বরতা বা নিট প্রজনন হার ১-এ (এন আর আর-১) সীমিত রাখতে হবে। বর্তমানে এই হার ২ দশমিক ৭।

প্রধানমন্ত্রী বাড়তি জনসংখ্যাকে সমস্যা মনে না করলেও বিশেষজ্ঞরা খুবই উদ্বিগ্ন। পরিকল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা বিভাগের সাবেক প্রধান মোহাম্মদ এ মাবুদের মতে, বর্তমানে দেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ১৪ ডেসিমেল। ৪০ বছর পর অর্থাৎ ২০৫০ সালে মাথাপিছু জমি কমে দাঁড়াবে আট ডেসিমেলে।

অধ্যাপক মাহফুজ চৌধুরী, যিনি জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন, তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন, তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে, তার প্রতি এত দিন যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু সমস্যাকে অগ্রাহ্য বা পাশ কাটিয়ে গেলেই তা শেষ হয়ে যায় না। তাতে এই দারিদ্র পীড়িত দেশটির পরিস্থিতি হবে আরও ভয়াবহ।

জনসংখ্যার এই মাত্রাতিরিক্ত চাপ ব্যাপক প্রভাব ফেলছে সমাজ ও রাষ্ট্রে। আবাসন, পরিবহনসহ সব খাতে সংকট বাড়ছে। জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশে ঘটেছে বিপর্যয়। হাসপাতালগুলো উপচে পড়ার পরও অসংখ্য নারী-পুরুষ ও শিশু বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা বাড়িয়েছে শিক্ষাসংকটও। চরম দারিদ্রের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু স্কুলে যাওয়ারই সুযোগ পাচ্ছে না। শৈশবেই তার ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য হয়।

যেসব দেশে যুব জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে, সেসব দেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে সদিচ্ছার প্রকাশ থাকলেও বাস্তবানুগ নয়। বর্তমানে প্রায় ৭০ লাখ বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশে আছেন, তাঁরা সবাই ভালো আছেন, সে কথা হলফ করে বলা যাবে না। মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরতদের বেশির ভাগ অদক্ষ। অনেকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন। কেউ কেউ আদম বেপারিদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত। প্রধানমন্ত্রী নিজ চোখেই সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ার শ্রমিকদের দুরবস্থা দেখে এসেছেন।

তা ছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে শ্রমিকের চাহিদা আগামী ১০ বা ২০ বছরে কী দাঁড়াবে, তা কেউ বলতে পারছে না। সে সম্পর্কিত কোনো তথ্যও সরকারের কাছে আছে বলে মনে হয় না। নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মতো অতি আবশ্যকীয় সমস্যাটি পাশ কাটানো হবে অবিবেচনাপ্রসূত, অদূরদর্শী ও আত্মঘাতী।

প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করুন আর না-ই করুন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা না নিতে পারলে, অদূরভবিষ্যতে মানুষের ভারেই বাংলাদেশ তলিয়ে যাবে, জলবায়ু পরিবর্তনে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

(সৌজন্য প্রথম আলো ১৯ জুন ২০১০)

আল্লার ঘর

সুনীল আচার্য

আজ থমথম করছে হিন্দুপাড়া। আতঙ্কে। পাশের মুসলিমপাড়া ফুসছে রাগে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি পুরো হিন্দুপাড়াটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। লোকে লোকে গমগম করছে হাকিম গাজির কাচারি ঘর। যা পরিস্থিতি! কী করা যায়, কী করা যায়—সিদ্ধান্ত নিতে সরগরম আলোচনা। সবার মধ্যেই উত্তেজনা। একটা কিছু করা দরকার।

জনমে শুনি নাই আল্লার ঘর কেউ ভ্যাইঙে দেয়।

কতো কি শুনবানে মিয়া, কলিকাল!

হ, হিন্দুদের কি বাড়, কি সাহস, আল্লার ঘর ভ্যাঙইয়া দিল! মনডা কাপলো না!

মনের দুঃখে হাবা শেখ দাঁড়িয়ে পড়ল। কি যেন বলতে যাচ্ছিল। ওকে চুপ করিয়ে বসিয়ে দিল সুবুর আলি।

চুপ কর শালা, মাথামোটা! বইসে পড়!

হাবা মনের দুঃখে বসে পড়ে চোখের পানি ফেলতে থাকে।

দুনিয়ায় কি আল্লার গজব ন্যাইমে আইলো। দিনে দিনে কত কি হবিনি। হায় আল্লা! মোমিনরা বাঁচবো তো!

এমন অবস্থায় সবার মনে দুঃখ। সবাই হাকিম গাজির দরবারে এসেছে। জেহাদ ইসলামের অঙ্গ। সে জেহাদ যদি ধর্মীয় কারণে হয় তবে তো কথা-ই নেই। ইসলাম রক্ষার জন্য জেহাদ করতেই হবে। সেটা যেভাবেই হোক। শরিয়তের বিধান।

হাকিম গাজি এখন গ্রামের মাতববর। গত বছর লাখ টাকা খরচ করে মক্কা থেকে হজ করে ফিরেছে। সে এক হিন্দু বিধবাকে ইতিপূর্বে জোর করে নিকা করে তার জায়গাজমি সব অধিকার করেছে। প্রাণের দায় বড় দায় তাই বিধবাটা সব মুখ বুজে মেনে নিয়েছে। তারই টাকায় হজ করে এখন গাজি হাজি। গাঁয়ের মান্যগণ্য একজন। তার কথা হাদিস সমান। সবাই মান্য করে। এমন বিপদের দিনে তিনি কি বিধান দেন তা শোনার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে আছে। মজলিসের সামনের সারিতে এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন মসজিদের ইমাম মতিন খান। চুপ থাকতে না পেরে 'বিসমিল্লাহের রহমতের রাহিম' বলে কথা শুরু করলেন :

যহোন এ্যামন গজব দুনিয়ায় নাইমে আইসে তহোন চুপ থাকা যায় না। মোমিনদের নিজের জ্ঞানগম্যি দিয়া বিধান নিতি হয়।

তা হলি কি করতি হবি হুজুর?

হিদুদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর।

ওরা নিরিহ। ওদের ওপর কেন? হাবা শেখ মিনমিনে গলায় বলে ওঠে।

চুপ কর শালা, চুপ কর! করিম আলি তেড়ে উঠতেই হাবা চুপ। তবু হাবা ভেবে পায় না কেন জেহাদ। কেন-বা প্রতিবেশির ওপর এমন অত্যাচার। বেচারা হিদুরা সাথেও নেই পাছেও নেই। ওরা কতদিন পাশাপাশি আছে। হৃদ্যতা আছে। কোন ঝগড়াঝাটি নেই। তবু একটা কিছু হলেই ওদের ওপর হামলা, অত্যাচার! ছোটবেলা থেকেই এ সব দেখছে হাবা। বুদ্ধি কম। তবু বোঝে সবাই মিলে, সব ধর্মের লোক মিলেমিশে একটা দেশের পরিচয়। শুধু হিন্দু, শুধু মুসলিম নিয়ে দেশ হয় না। সে দেশ মরুভূমির সমান।

মিটিং চলছে। জমজমাট। কেউ বলছে: ওঘরের বাড়িঘর জ্বালায়ে দাও। কেউ বলছে। ওঘরের জানমাল লুট কর। যারা একটু বেশি চরমপন্থী তারা বলল : ওঘরের কুপিয়ে শেষ কর।

এসব কথা শুনে হাবা অস্থির হয়ে পড়ে। এটা অন্যায়, এটা অন্যায়! অন্য দেশের ঝগড়া কেন নিজের দেশে ঢুকায়—মোটামাথায় হাবা ভেবে কূলকিনারা পায় না। অগত্যা চুপচাপ থাকতেই মনস্থ করে। এসব মিটিংফিটিং-এ তার বিশ্বাস নেই। সব জায়গাতেই স্বার্থ। স্বার্থ ছাড়া কেউ ধর্মেও নেই। জিরাফেও নেই। কে একজন উত্তেজিত হয়ে বলল : শালা, ভারতের বিজিপি সরকার আমাঘরের আল্লার ঘর ভাঙে দেছে। আমরাও হিদুদের হরির ঘর ভাঙইয়া দিবানে।

অতএব মিটিং শেষ হল। সিদ্ধান্ত যা তাই হল। দিন গড়িয়ে রাত এল। রাত ক্রমে ক্রমে গভীর হল। গ্রামীণ পথঘাট নিশুতি ঘুমের কোলে ডুবে গেল। শুধু ঝোপঝাড়ে একটানা ঝিঁঝি তারস্বরে ডেকে চলল। কিছু রাতজাগা কুকুর রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে ঘেউ ঘেউ ডেকে চলেছে। তার ডাকে কেউ কেউ চমকে নিদ্রা ভেঙে জেগে উঠে পুনরায় ঘুমে পড়ছে। আজকের রাতটা কেমন অস্থিরতায় চৌচির। অন্যদিনের মত সুস্থির নয়।

হিন্দুপাড়ার সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। তারা নিশ্চিত মনেই ঘুম যাচ্ছিল। তারা জানে হয়তো তাদের কেউ কিছু করবে না। এমন ঘটনায় তারাও বিভ্রান্ত।

মুসলমান পাড়ায় মসজিদের অঙ্গনে তখন সাজসাজ রব। প্রত্যেকের হাতে মশাল জ্বলে উঠল। মসজিদের ইমাম দোয়া-খোদবা পাঠ করে, নারেক তকবির ধ্বনি দিয়ে সবাইকে উৎসাহিত করল : শোন মোমিনগণ, তুমরা ধর্মযুদ্ধে যাচ্ছ। পিছ পা হবা না।

মশাল হাতে সবাই পিলপিল সারিতে যাচ্ছে। মশালের আলোতে মনে হচ্ছে সবাই যেন শিকারে যাচ্ছে। তার মধ্যে কারো কারো চোখে লোভের আভা। ইতিপূর্বেও তারা হিন্দুদের বাড়ি-ঘর লুট করেছে এইসব অছিলায়। কিন্তু এবারের বিষয় অন্য।

খুশখুশে কাশিতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না নিবারণ মাঝির। ছেলে মাছ ধরতে গেছে। ঘরে সে আর তার বৃদ্ধা স্ত্রী। হঠাৎ মশালের আলো, আর আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে তার বুক কেঁপে উঠল। আবার কি হল? সে তো তেমন কিছুই জানে না। তবু দাওয়ায় কান খাড়া করে চুপচাপ বসে থাকলো। তার বাড়ি থেকে তিনশ ফিট দূরে হরিসভার আঙিনা। কালীমন্দির। কালীমন্দির খড় আর বাঁশের তৈরি। গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দা মাঝি। মাছ ধরা তাদের পেশা। কিন্তু ইদানীং বিল-বাওড়ে, নদী-নালাতে সেই মাছ আর নেই। তাই মাঝিদের দুবেলা পেট পুরে খাবারো জোটে না। ঠাকুরের ঘর কি করে পাকা করবে! মশালের আলোয় মাঝিপাড়াটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভয়ে-ত্রাসে। দুবৃর্ত্তরা ধীরে ধীরে হরিসভার আঙিনার দিকে যাচ্ছে সেটা নিবারণ মাঝি অনুমান করতে পারল। তারপর খড়-বাঁশ পোড়ার গন্ধ। কে যেন চিৎকার করে উঠল : আগুন, আগুন!

দুবৃর্ত্তরা ঠাকুর ঘর পুড়িয়ে আর এক পাড়ার দিকে অগ্রসর হল। আশেপাশে যাকে পেল তাকে বেদম মারধর করল। ঘুম হচ্ছিল না বলে প্রভাত মাঝি রাস্তায় পায়চারি করছিল। দুবৃর্ত্তরা তাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিল। আর যাবার সময় বলল : শালা মালায়ন আল্লার ঘর ভাঙবি। এবার গজবটা বোঝ! প্রভাত অজ্ঞান হয়ে মাটিতে ঢলে পড়ল। ওরা অন্য পাড়ায় চলে গেল।

প্রতিদিনের মত প্রাণঠাকুরও তার রামগোপালের মন্দিরে নিদ্রা দিচ্ছিল। আগুন আগুন চিৎকার শুনে লাফিয়ে উঠলেন। তার লাফানো দেখে মন্দিরে থাকা পায়রাগুলো পতপত শব্দ তুলে অন্ধকারে উড়ে গেল। প্রাণঠাকুর বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন মশালের আলো তার মন্দিরের দিকেই এগিয়ে আসছে। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। খবরে শুনেছেন ভারতে বাবরি মসজিদ বিজেপিরা ভেঙে দিয়েছে। এটা যে তার জের সেটা বুঝতে পারল।

সংসারে আপন বলতে তার কেউ নেই। একে একে সব গেছে। এখন শুধু সে-ই আছে পিতৃপুরুষের ভিটা আঁকড়ে। একটা মেয়ে ছিল। কয়েক বছর হলো আত্মহত্যা করেছে।কেন আত্মহত্যা করল তা ভাবলে আজও শিউরে ওঠেন! সে দিন ছিল আকাশে মেঘ। বাদল ঝরা দিন। সকাল

আল্লার ঘর

থেকে বৃষ্টি ঝরছিল টিপটিপ করে। কিছুই ভালো লাগছিল না। মেয়েটার রাত থেকে জ্বর। ওষুধ আনতে হবে। বাধ্য হয়ে প্রাণঠাকুর বাজারে গিয়েছিল ওষুধ কিনতে। ওষুধ এনে ঘরে ঢুকতেই বোবা। মেয়ে তার গলায় দড়ি নিয়ে ঘরের শিলিং-এ ঝুলছে। সে কি দৃশ্য! প্রাণঠাকুর মুর্চ্ছা যায়। পাড়ার প্রতিবেশিরা তাকে সান্ত্বনা দেয়। শুশ্রূষা করে। তারপর সব ঘটনা জেনে পাথর হয়ে যায়। পাশের পাড়ার মুন্না মোল্লার ছেলে ফাঁকা বাড়ি দেখে ঘরে ঢুকে মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। ভাবতেই পারে না। হায়, ভগবান! তারপর কোটকাচারি হলো। বিচারে ছেলেটার দশ বছরের জেল হলো। তাতে কি, তার মেয়ে তো আর ফিরে এলো না! দিনে দিনে পাড়ার প্রতিবেশিরা সব একে একে চলে যাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে। কোথায় যায় তা প্রাণঠাকুর জানে। হঠাৎ আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে প্রাণঠাকুর সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন। তারপর কোন দ্বিধা না রামগোপালকে কোলে করে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। সেখানে সাপের রাজত্ব। পোকা-মাকড় ভর্তি। জীবনের মায়া থেকেও ঠাকুরের বাঁচানো তার কাছে বেশি জরুরি। চৌদ্দপুরুষের এই রামগোপালের মূর্তি। কত দিন, কত রাত ঠাকুরের পুজো দিয়েছে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছে। জীবন জুড়ে যে রামগোপালের উপস্থিতি তাকে হারানো প্রাণঠাকুরের প্রাণের অতীত। সে জঙ্গলের গভীর থেকে আরো গভীরে যায়। সেখানে কেমন সোঁদা মাটির গন্ধ। প্রাণ কেমন করে ওঠে। পায়ের চাপে কাঁটাঝাঁঝি আর কুলেখাড়ার কাঁটা পায়ে বিঁধে যায়। আঃ করে ওঠে। তবু প্রাণের ভয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকতে থাকে। পাশের খাদে ডুবিলতা, জলপালক থকথক করছে। অন্ধকারে টোকাপানা, কচুঘেচু, ঢোলকলমি বন দুলে ওঠে। থানকুনি, শুসনি শাক, চিকনি শাক পায়ের চাপে মচমচ করে ওঠে। খাদের জলে শালুকঝোপে পানকৌড়ি কি বেলে হাঁস মানুষের সাড়া পেয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেলে প্রাণঠাকুরও ভয় পায়। তবু ঘন বনের দিকে নিরাপদ ভেবে দ্রুত হাঁটতে থাকে। তারপর বাঁশঝাড়ের বাঁশ বেয়ে উপরে ওঠে। তারপর বাঁশের কঞ্চির উপর ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে। আর অপেক্ষা করে কি হয়, কি হয়।

এদিকে দুবৃর্ত্তরা মন্দিরে প্রাণ ঠাকুরকে খোঁজে। রামগোপালের মূর্তি খোঁজে। কিন্তু পায় না। ওরা রেগে মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর নারেক তকবির, আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিতে দিতে অন্যপাড়ার দিকে চলে যায়। প্রাণঠাকুর রামগোপালকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছে। হরি হরি করছে। আর ভাবছে কোথাকার কোন বিজেপি দল একটা আল্লার ঘর ভেঙেছে। আর তার জন্য এখানে গ্রামের পর গ্রাম, পাড়ার পর পাড়া অন্যধর্মীদের আল্লার ঘর ভাঙছে। আল্লার ঘর কি আলাদা? ওরা বোঝে না!

আদিবাসী নাম-বিতর্ক

মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী
(অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট)

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে সকালবেলা আদিবাসী নাম-বিতর্ক বিষয়ে লিখতে বসে প্রথমে মনে পড়ল কল্পনা চাকমাকে। ১৯৯৬ সালের এই মাসের ১২ তারিখে গভীর রাতে অপহৃত এবং নিখোঁজ হওয়া হতভাগ্য এক পাহাড়ি মেয়ের নাম কল্পনা চাকমা। কী অপরাধ ছিল তাঁর? স্নাতকপড়ুয়া এই মেয়েটি ছিলেন 'হিল উইমেন্স ফেডারেশন'-এর একজন নেত্রী। তিনি নিজেদের অধিকারের কথা বলতেন, তর্ক করতেন, প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিতেন। কল্পনার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা গণমাধ্যমে ঝড় তুলেছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্বিগ্ন করেছিল। তাঁর নির্দেশে একটি তদন্ত কমিটি কি আদৌ রিপোর্ট তৈরি করেছিল, না পরবর্তী সরকার সেটা ধামাচাপা দিয়েছিল, তা আর জানা যায়নি।

কবি জড়িতা চাকমার লেখা কল্পনা চাকমা কবিতাটি থেকে তিনটি পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে নিখোঁজ মেয়েটিকে স্মরণ করা যাক ঃ 'স্বদেশ প্রেমের চিন্তা-চেতনায়/নিপীড়িত নারীসমাজের প্রতিরোধ দুর্গ গড়েছ তুমি/তাই লিখে যাব তোমাকে নিয়ে শতাব্দীকাল ধরে।'

মন্ত্রিপরিষদে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন'-এর খসড়া বিল অনুমোদিত, ও পরে জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিলটি পাস হওয়ায় এখন তা আইনে পরিনত হয়েছে। বিলটিতে বাংলাদেশের আদিবাসীদের নতুন নামকরণ করা হয়েছে যে তারা 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী'। অর্থাৎ আইনটি কার্যকর হওয়ার ফলে এতকাল আদিবাসী নামে তাদের যে পরিচয় ছিল, সেটা আইনত বাতিল হয়ে গেল, এখন তাদের পরিচিতি হবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। এই শব্দগুচ্ছটি কার কিংবা কাদের মস্তিষ্ক থেকে বের হয়েছে এবং কেন বের হয়েছে, সেটা মৌখিকভাবে জানতে পারলেও লিখিত সাক্ষ্য-সাবুদ এখনো না পাওয়ায় সে বিষয়ে এখন লিখছি না। তবে আসুন প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, বাংলা ভাষার অভিধান খুলে পড়াশোনা করা যাক। নৃ-শব্দটির অর্থ নয়, মনুষ্য, মানুষ। শব্দটি বাংলা ভাষায় উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যথা—নৃকপাল, অর্থ নরমুণ্ড কিংবা নৃকেশ্বরী, অর্থ নরশ্রেষ্ঠ। ইংরেজি ভাষায় নৃ শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে 'অ্যানথ্রপ' যথা—অ্যানথ্রপলোজি, অর্থ নৃতত্ত্ব, কিংবা অ্যানথ্রপইড, অর্থ নৃসদৃশ।

অতএব দেখা যাচ্ছে, নৃ-গোষ্ঠী শব্দগুচ্ছটির অর্থ হচ্ছে মানবগোষ্ঠী। যিনি কিংবা যাঁরা এই শব্দগুচ্ছটি তৈরি করেছেন, দেখা যাচ্ছে, তাঁর কিংবা তাঁদের মতে, বাংলাদেশের নাগরিকেরা দুই ভাগে বিভক্ত—বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠী আর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। সে ক্ষেত্রে আমি আর বাঙালি থাকছি না, আমিও হয়ে যাচ্ছি বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠী।

নৃ-বিজ্ঞান পরিভাষা আদিবাসী শব্দটির এই সংজ্ঞা দেয়; 'কোনো এলাকার প্রাচীন জনবসতি ও তাদের সংস্কৃতি বোঝাতে টার্ম বা পদটি ব্যবহৃত হয়। আধুনিক জনগোষ্ঠীর জৈব সামাজিক প্রভাবজাত নয়, এমন জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলা হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই কমবেশি আদিবাসী রয়েছে। সাধারণভাবে পার্বত্য এবং অরণ্য অঞ্চলে বসবাসকারী শতাব্দীর লালিত সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের আদিবাসী বলা হয়। সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা সবচেয়ে আদিম জনগোষ্ঠী।' এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশের উত্তর-মধ্য ও উত্তর-দক্ষিণ অংশে লাল শক্ত মাটির ঢিবি ও পাহাড়ি অঞ্চলের নাগরিকদের আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা খুবই সহজ। বাংলাদেশের বরেন্দ্র অর্থাৎ সমতল অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাংশের নাগরিকদের মধ্যে অবাঙালি প্রাচীন জাতিগুলোকে আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করাও তেমনি সহজ হবে, যদি ইতিহাস থেকে সাক্ষ্য নেওয়া হয়। খুব বেশি দূরবর্তী সময়ের কথা নয়। বাংলাদেশের বরেন্দ্র ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অনাবাদি ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এই অঞ্চলগুলোকে যারা বসতযোগ্য ও আবাদযোগ্য করেছে সেসব সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি জাতিগুলোই বাংলাদেশের সমতল আদিবাসী।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে বাগেরহাট জেলায় যে আদিবাসীদের বাস, তারা রাজবংশী জাতি। উত্তর বাংলা ও দক্ষিণ বাংলার আদিবাসীদের নামে তাদের স্বত্বদখলীয় জমির যে খতিয়ানগুলো ইংরেজ আমলে ও পরবর্তী সময়ে প্রস্তুত হয়েছিল, সেগুলোতে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। বস্তুত বাংলাদেশের আদিবাসীরা ৪৫টি পৃথক জাতিভুক্ত। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় বাঁধা পড়া বাঙালি ও এসব আদিবাসী নরনারীর দেহমন মিলিয়েই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সত্তা। এই ভৌগোলিক ভাগ্যই যে আমাদের গর্ব, সেটাই উচ্চারিত হয় জাতীয় সংগীতে ঃ 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' আদিবাসী শব্দগুচ্ছটি পাওয়া যায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে—আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনী অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ 'ভূমি কমিশন' গঠন করা হবে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ কর্তৃক ২০০৬ সালের ২৯জুন আদিবাসী জনগণের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছে।

ঘোষণাটিতে সর্বমোট ৪৬ টি অনুচ্ছেদ আছে এবং অনেকগুলো অনুচ্ছেদের একাধিক দফা আছে। কয়েকটি অনুচ্ছেদের অনুদিত উদ্ধৃতি এই ঃ 'আদিবাসী জনগণের রয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এই অধিকারের বলেই তারা তাদের রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারণ করতে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে সক্ষম।' (অনুচ্ছেদ-৩) 'প্রত্যেক আদিবাসী জনগণের রয়েছে একটি জাতীয়তা অর্জনের অধিকার' (অনুচ্ছেদ-৬)। 'আদিবাসী জনগণের রয়েছে সেসব ভূমি, ভৌগোলিক এলাকা ও সম্পদসমূহের ওপর অধিকার, যা তারা ঐতিহ্যগতভাবে অধিকার, দখল বা অন্যভাবে ব্যবহার অথবা অর্জন করে এসেছে' (অনুচ্ছেদ ২৬, দফা ১)। 'আদিবাসী জনগণের রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রথাসমূহ চর্চা ও পুনরুজ্জীবনের অধিকার।...(অনুচ্ছেদ ১১, দফা ১)

সম্ভবত জাতিসংঘের উপরিউক্ত ঘোষণাপত্রের তাগিদে প্রণীত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনটির শুরুতে বলা হয়েছে, 'যেহেতু বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়'। আইনটির ৪ ধারায় বলা হয়েছে, 'এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।'

আইনটিতে উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেটা এই—নেত্রকোনা, রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, রাজশাহী, মৌলভীবাজার ও অন্য যেকোনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান; অথচ বগুড়া জেলার একটি উল্লেখযোগ্য এলাকায় ওঁরাও আদিবাসী বাস করলেও উপরিউক্ত তালিকায় নির্দিষ্টভাবে বগুড়ার নাম উল্লেখ করা হয়নি। আইনটির তফসিলে ২৭টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে, যা অশুদ্ধ এবং আদৌ তথ্যভিত্তিক নয়। যে কেউ এযাবৎকাল প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বইগুলো পড়ে থাকলে তালিকাটি পড়ে বিরক্ত হবেন। কারণ আমরা প্রায় সবাই জানি, আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে ৪৫টি হবে।

সবচেয়ে আপত্তিজনক এবং দুঃখজনকও বটে, আদিবাসীদের নাম আইনটিতে বদলিয়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী করা। কিন্তু যিনি বা যাঁরা করেছেন, তিনি বা তাঁরা বামালসুদ্ধ ধরা পড়ে গেছেন। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। অন্যায় কাজ করলে তার চিহ্ন কাজটির মধ্যেই ধরা পড়ে। প্রিয় পাঠক/পাঠিকা লক্ষ করুন, আইনটির ২ ধারার ২ উপধারা, যার উদ্ধৃতি এই ঃ 'ক্ষুদ্রয নৃ-গোষ্ঠী' অর্থ তফসিলে উল্লিখিত বিভিন্ন আদিবাসী তথা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও শ্রেণীর জনগণ।'

এই উপধারাটি স্বীকার করছে আদিতেই 'আদিবাসী' ছিল, কিন্তু এখন তাদের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী করা হলো। আমার জন্ম রাজশাহী শহরে মাতামহীর বাড়িতে। রাজশাহীর সাঁওতাল আদিবাসীদের নেতা ছিলেন সাগারাম মাঝি। তিনি ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি রাজশাহী শহরের সাগরপাড়ায় আদিবাসীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি আদিবাসী ছাত্রাবাস। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। দেশ স্বাধীন হলে তিনি ছাত্রাবাসটি দ্বিতল ভবন করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেটার নামকরণ হয় 'সাগারাম মাঝি আদিবাসী ছাত্রাবাস।' এখন আলোচ্য আইনটি জাতীয় সংসদে পাস হওয়ার পর ওই ছাত্রাবাসের নেমপ্লেট ফেলে দিয়ে কি নতুন নেমপ্লেট বসাতে হবে, যাতে লেখা থাকবে 'সাগারাম মাঝি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ছাত্রাবাস?' কিন্তু যদি বলা হয়, আলোচ্য আইনটির আওতায় ছাত্রাবাস পড়বে না, তাহলেও রাজশাহীতে আলোচ্য আইনের আওতায় যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে, তার নাম তো দিতেই হবে রাজশাহী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান', তখন ছাত্রাবাসের নেমপ্লেট আর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নেমপ্লেট পড়ে কি হাততালি দেওয়া যাবে?

(প্রথম আলো ২৫ জুন ২০১০)

প্রকাশক, মুদ্রক —সুভাষ চক্রবর্ত্তী, ৮৫ এ পি সি রোড, কোলকাতা-৯, প্রধান কার্যালয় ঃ স্কুলপাড়া, শ্রীখণ্ডা, কোলকাতা - ১৫২ কর্তৃক প্রকাশিত
আনন্দ প্রিণ্টার্স, ৩/১সি মোহনবাগান লেন কোলকাতা - ৪ হইতে মুদ্রিত
সত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক ঃ সুভাষ চক্রবর্ত্তী
ফোন নং ঃ ৯২৩৯৭৬৯৯৩৮